**নীলুর দুঃখ – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।**

**দুঃখ কি কোন বোধ না অনুভুতি। যতক্ষণ সেটি বাক্তিগত স্তরে,ততক্ষণ সেই দুঃখ ভাব নিজের চাওয়া=পাওয়ার মধ্যেই সীমাব্দধ।এই সীমিত দুঃখ অনুভব,** surface level এআটকে থাকে।**যখনই তা** deep level-এ **পৌঁছে যায় তখন তা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত থাকে না,তা নৈব্যক্তিক হয়ে যায়।এই যে** personal **থেকে** impersonal**-এ উত্তরণ,তখন তার অনুভূতিতে চিহ্ন ফেলে সমাজের দুঃখ ।নিজস্ব ব্যর্থতা তখন হয়ে যায় সমাজসম্পৃক্ত ।কেউ ভাবতেই পারেন এ দুখানুভুতি ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কার সাথে যুক্ত ।**সব মানুষই তো ক্ষমতা(power)চায়, যা তাকে সুখী জীবন দেবে।সুখ হারানোর ভয়ে দুঃখের আশঙ্কায় ব্যক্তির কাতর ক্রন্দন আমাদের মনে সমবেদনা -সহানুভুতি জাগিয়ে তুললেও তা রসানুভুতি সৃষ্টি করে না,তার ব্যাপ্তি tragic মহিমায় গণ্য হয় না।কিন্তু যদি সেই দুঃখানুভুতির ব্যর্থতাজনিত নৈরাশ্যের নেপথ্যে সমাজের বৃহত্তর ব্যর্থতার অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে তখন তা সীমানা অতিক্রম এক অনরণীয়ান মুহূর্ত তৈরি করে,যা শোপেনহারীয় দুঃখবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে এক বিষন্নতার ঢেউ তোলে।সেই বিষন্নতার লেগে থাকে দৈনন্দিন জীবনের খুচরো না পাওয়ার কথা ,আশে–পাশের চিরাচরিত প্রথাগত মানুষের খুবই সাধারণ জীবনের সাদা-কালো ছবি।যা হয়তো হয়ে উঠতে পারতো রঙ্গিন,কিন্তু কী তুচ্ছ নগণ্য কারণেই তা বিবর্ণ হয়ে যায়।বর্ণহীন জীবনের গতানুগতিকতায় বাঁধা মানুষের জলছবি।কখনও কখনও সেই সাধারণ জলছবিতে অনেক না বলা কথা থেকে যায়। দুঃখ তখন আর বাক্তিগত থাকে না,সে দুঃখে জড়িয়ে যায় সময়, হয়তো বা দার্শনিক ঐতিহ্য–আনন্দময় রস নিস্পাত্তি ঘটে যায়।

প্রথম পাঠে এ গল্প নীলুর;এক যুবকের।যাকে বলা যেতে পারে মিমেটিক পাঠ। অর্থাৎ কাহিনীর সঙ্গে তার পাওয়া না-পাওয়ার অনুভব জড়িয়ে আছে এ গল্পের পরতে পরতে।এক নিন্ম মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের চেনা ছবি, পরিবারের বড় ছেলে যার নাম নীলু তার দায়িত্ব–কর্তব্যবোধ–রোমান্টিকতা–অসহায়তা–স্বপ্ন সবকিছু নিয়ে খুবই পরিচিত ছবি ।তবুও নীলুর দুঃখ যে আমাদের স্পর্শ করে তা কেবল একান্তই বাস্তবের যোগসূত্র স্থাপনের জন্যই নয়।নীলুর দুঃখের জন্য নয়,আসলে গল্প “নীলুর দুঃখ’ নয় ,দুঃখ– নীলুর,পোগার,নীলুর বাবার,জগু–জাপান–ব্রিটিশের মতো যুবকদের,বাসযাত্রীদের,বাস কনডাকটরের,বল্লরীর,হরলালের জ্যাঠামশাই,নীলুর ভাই সাধনের।ফলে নীলুর দুঃখকে ছাড়িয়ে কথকের লেখনীতে উঠে আসে মানুষের দুঃখের কথা। আর তখনই গল্পটি মিমেটিক লেভেল থেকে হারমেনিউটিক লেভেলে উঠে আসে।অর্থ থেকে তাৎপর্যের কথনে যেমন ধরা পড়ে সময়ের চিহ্ন।তেমনই ধরা পড়ে দুঃখের মধ্য দিয়ে সকলের দুঃখকে জড়িয়ে হৃদয়ের অপার ভালবাসার গল্প।

একজন অপরকে স্পর্শ করতে চাইছে সুখের মধ্য দিয়ে নয়,দুঃখের মাঝে দাঁড়িয়ে। চাওয়া-পাওয়ার যে হিসাবে সুখ মিলিয়ে গিয়ে দুঃখের আবির্ভাব,তা কখন যে সেই দুঃখটাই পূর্ণ করে দেয় হৃদয়ের রিক্ততাকে–না পাওয়ার বেদনাকে।সমাজের দুঃখময় জীবনের মাঝে শুধু ব্যর্থতা জনিত নৈরাশ্যের ছবি থাকে না,থাকে না ব্যর্থতার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা ,ব্যর্থতার বেদনাকে ভুলে থাকার জন্যে নেশার আশ্রয়।আবার অসম সমাজের গ্লানিই নুতন স্বপ্ন দেখার প্রত্যয় গড়ে তোলে।সবকিছু মিলে দুঃখের যে ঐকতানের ছবি ফুটে ওঠে এ গল্পে,তার মধ্য থেকে উচ্চারিত হয় ভারতের নিজস্ব দুঃখবাদী জীবনবোধের আর্তি ।সেই আর্তিই গল্পটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে।

ছত্রিশ বছরের শরীর আর তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে পোগো ঘুরে বেড়ায় আর স্বপ্ন দেখে মার্ডারের।কিন্তু মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।জগু– জাপান-ব্রিটিশ এরা বেকার,পাড়ায় সাট্টা খেলে,জুয়া খেলে,মাতাল।সমাজের চোখে ছোটলোক।সমাজ এদের গায়ে দাগিয়ে দিয়েছে ছোটলোক বলে;মাতাল জুয়াড়ি বদ ছেলে বলে।এরা এদের দুঃখ ভুলে থাকতে চায় নেশা করে ।এ–দুঃখের সমব্যথী নীলুও।তাই তার পাওনা ত্রিশ টাকা ব্রিটিশের কাছ থেকে সে কাল নেয় নি,কারণ কি মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় ভেবে।কিংবা সামান্য দুশো টাকা দিয়ে যদি কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজের ব্দ ছেলে তিনটি একটু দুঃখ ভুলে থাকতে পারে এই ভেবে ।

বাবার প্রতি নীলুর করুণা হয়।রেলের রিটায়ার্ড গার্ড,পরে ব্যবসায় ফেল মেরে রোজগেরে ছেলেদের মাস-মাইনের টাকা পোস্ট অফিসে রেখে সংসার চালাবার চেষ্টা করেন।মাসের শেষ সপ্তাহে আর পেরে ওঠেন না,তখনই ডুব দেন সংসারের বাঁধন থেকে।সারাজীবন হিসেব করে মেপে-মেপে তো আর চলা যায় না,কখনও কখনও হিসেবের বাইরে নিজেকে সরিয়ে ফেলতে হয়।নিজের স্বপ্ন,ভাবনা,স্বাধীনতা হারানর দুঃখ নীলুর বাপকে ‘টিকরমবাজ` আখ্যা দেয়।তবুও নীলু বোঝে ব্যাঙ্কের উইথড্রয়াল ফর্মে কেন বাবার দস্তখত মেলে না।হাসিমুখে বাবার নতুন কেনা সিগারেটের প্যাকেটের সেলফোন ছেঁড়ার গভীরে লুকিয়ে থাকে অনেক দুঃখ,আবার দুঃখের মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রশান্তি,ছেলে নীলু পারবে দায়িত্বটা সামলাতে ।

বন্ধু শোভন ও বল্লরীর এবং তাদের সন্তান মিলি-জুলির ভরন্ত সংসার দেখে নীলুরও কি মনে ইচ্ছা জাগে না সুখী জীবনের।কিন্তু তার ও কুসুমের সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে।বাড়ীর কথা ভেবে কুসুমকে নীলু তাদের অভাবের সংসারে আনতে পারে নি ।প্রেমকে কি কষ্ট দেওয়া যায়।সে কুসুমই হোক বা পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের মানুষগুলি।সে কি মহান হতে চেয়েছিল?না কি নিজের আশা- আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে দুঃখের মধ্যেই স্বস্তি খুঁজতে চেয়েছিল।

নীলুর ভাই সাধন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে।বাড়ীতে আসে,তবু সম্পর্কের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সময়।অধিকারহীন অসম সমাজের প্রতি তীব্র এক জ্বালা বুকে নিয়ে বেড়ায় ।তবুও ক্ষয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে দাদা নীলুর প্রতি সাধনের মনে মায়া জাগে।দাদার রোগা হয়ে যাওয়া চেহারা,কুসুমদির সাথে বিচ্ছেদ, সংসারকে আগলে রাখার জন্য প্রানপাত পরিশ্রম সাধনের হৃদয়ে ভাষাহীন নৈশব্দের সৃষ্টি করে।নীলুরও জানতে ইচ্ছে করে সাধন কেমন আছে,একই বাড়িতে থেকে কি করে যে দু-ভাইয়ের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায় তা দুজনেই বুঝতে পারে না ।পথচলতি অচেনা মানুষের মত কয়েক পলক পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখে নির্জন গলিপথে,বাঙময় হয়ে উঠতে চায় গলিপথ,তবুও নিঃশব্দে দুজনেই চলে যায় নিজের নিজের পথে ।কিন্তু গলিপথের নৈশব্দের গভীরে যে পারস্পরিক দুখানুভবের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে,তখন দুঃখটা আর নীলু ও সাধনের বাক্তিগত স্তরে আবদ্ধ থাকে না।সমজে-বিবিক্ত বাক্তির সব দুঃখের মেলবন্ধন ঘটে যায়।সেখানের দুঃখময় জীবনের ভাঁড়ারে যে পূর্ণতার ছবি মেলে সেখনে শুধুই দুঃখ থাকে না,তা আনন্দময় নৈশব্দের স্তরে উত্তরণ ঘটে যায়।

নীলুরও ভয়ংকর ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে মার্ডার করতে ইচ্ছে করে,চারপাশের অসহনীয় অসম সমাজের পরিবেশ নীলুকে আবেগঘন করে তোলে।পরে আবেগ অপসৃত হলে এক তীব্র অবসাদ তাকে ঘিরে ফেলে।তবুও এই উত্তেজনা,আবেগ,অবসাদ,মানুষের বিচ্ছিন্নতা,গোপন দুঃখ অপ্রাপ্তির মাঝে কোন বিশেষ ক্ষণেঃ

*“নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু,পাশে পোগো।সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে।তারপর-যা নীলু কখনও কাউকে বলতে পারে না –হৃদয়ের দুঃখের গল্প –কুসুমের গল্প –অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।*

 *পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।``*

ক্তহক নীলুর দুখের কথা,শুধুমাত্র পোগোকেই নিবিষতচিত্ত শ্রোতা করে তোলে না,পাঠকের মনেও এক অনরণীয়ান মুহূর্ত গড়ে তোলে।এক আনন্দময় বিষাদ্ঘন রসে আমরা অভিষিক্ত হই।